কিশোরী প্রশিক্ষণ সহায়িকা

আমরা সকলেই জানি একটি শিশু জন্মের পর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এই বড় হওয়ার বিভিন্ন ধাপ থাকে। ধাপে ধাপে ছোট্ট শিশু শৈশব পেরিয়ে প্রথমে কৈশোরে, তারপর যৌবনে পৌঁছায়, এরপর একসময় বুড়ো হয়ে যায়। অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। জন্মের পর কৈশোর বা বয়ঃসন্ধির পূর্ব পর্যন্ত সময়টাকে বলে শিশুকাল বা শৈশব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে শৈশব আর যৌবনের মাঝামাঝি সাধারণতঃ ১০-১৯ বয়স পর্যন্ত সময়কে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কিশোর ও মেয়েদের কিশোরী বলা হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত এবং ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ১২/১৩ বছর হতে ১৯-২১ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এই বয়ঃসন্ধিকালকে ০৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে: সাধারণত ১০/১১ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোর, ১৫ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত মধ্য কৈশোর এবং ১৮ থেকে ১৯-২১ বছর পর্যন্ত পূর্ণ কৈশোর।

কৈশোরে ছেলেরা লম্বা হতে থাকে, তাদের কাঁধ চওড়া হয়, গলার স্বরের পরিবর্তন আসে ও মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে। একইভাবে মেয়েদের শরীরও বাড়তে শুরু করে, মেয়েলি পরিবর্তনগুলো শুরু হয় এবং চেহারায় লাবণ্য আসে। এ সবটাই বড় হয়ে ওঠার লক্ষণ।

বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় ছেলে আর মেয়েদের মনে পরিবর্তন আসে। এ বয়সে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আবেগ আর অস্থিরতা কাজ করে। কখনো মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে, আবার কখনো মন খুশিতে ভরে যায়। কেউ হয়ে ওঠে অভিমানী, কেউবা কৌতূহলী। কেউ কেউ সৌন্দর্য সচেতন হয়ে ওঠে, সুন্দর জামা-কাপড় পরতে পছন্দ করে এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কেউ আবার একা থাকতে পছন্দ করে-কারো সামনে যেতে চায় না। তবে এই পরিবর্তনগুলো সাময়িক। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। কৈশোরের এইসব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা জানতে চেষ্টা করবো।

কৈশোরের পরিবর্তন

কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক দুই ধরণেরবিকাশই খুব দ্রুত হয়ে থাকে। এর ফলে যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হলো: (১) শারীরিক পরিবর্তন, (২) মানসিক পরিবর্তন ও (৩) আচরণগত পরিবর্তন।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের-

(১) শারীরিক পরিবর্তনগুলো হলো:

ক) উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়;
খ) ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়;
গ) স্তন বড় হতে শুরু করে;
ঘ) বগলে ও যৌনাঙ্গে চুল গজায়;
ঙ) কোমর সরু হয়;
চ) নিতম্ব ভারী হয়;
ছ) জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়;
জ) ব্রণ ওঠে ও
ঝ) গলার স্বর মিষ্টি ও সুরেলা হয়।

এই পরিবর্তনগুলো মেয়েদের ক্রমশ: বড় হওয়ার স্বাভাবিক লক্ষণ।

(২) মানসিক পরিবর্তনগুলো হলো:

ক) অজানা বিষয়ে জানার কৌতুহল বাড়ে, চলাফেরায় চঞ্চলতা বাড়ে;
খ) স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা হয়, কেউ কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে;
গ) আবেগের দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন-কখনো মন চঞ্চল হয় আবার কখনো বা বিষন্ন হয়, নানা ধরণেরদ্বিধা-দ্বন্ধ ও অস্থিরতা কাজ করে;
ঘ) বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে অনেকের লাজুকভাব বেড়ে যায়;
ঙ) সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে, বিপরীতে লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, যৌন বিষয়ে চিন্তা আসে;
চ) পারস্পরিক সম্পর্ক নতুনভাবে তৈরি হয়;

ছ) বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অনুকরণ করে;
জ) পারিবারিক শাসন নিয়ে বিরোধ হয়;
ঝ) অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের প্রবণতা বাড়ে ও
ঞ) কল্পনাপ্রবণ হয়।

তবে এই পরিবর্তনগুলো সাময়িক। বড় হওয়ার সাথে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

(৩) **আচরণগত পরিবর্তন:** বয়ঃসন্ধিকালে আশেপাশের পরিচিত বা অপরিচিত মানুষ হঠাৎ করেই কিশোর কিশোরীদের বড় ভাবতে শুরু করে। আবার, একই সঙ্গে বড়দের মতো আচরণ করলে সেটাও ভালো চোখে দেখে না, পাকামো বলে মনে করে। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাই এ সময়কে বিপত্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎ করেই নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তনের কারণে তাদের আচরণেও পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন:

ক) এ সময় কিশোর কিশোরীরা বড়দের মতো আচরণ করে;
খ) নিজকে সতন্ত্র পরিচয়ে প্রকাশ করতে চায়;
গ) নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে;
ঘ) আবেগময় আচরণ করে, বীরত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আগ্রহ বাড়ে;
ঙ) অনেকে খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়;
চ) আবার অনেকে শারীরিক পরিবর্তনসমূহের কারণে কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্থ থাকে। তাই সমাজ থেকে নিজকে আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

একইভাবে এ সময়ে ছেলেদের তথা কিশোরদের শরীরেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। যেমন: গলার স্বর মোটা হয়ে যায়, ব্রণ ওঠে, গোঁফ গজাতে শুরু করে, পুরুষাঙ্গের চারপাশে চুল গজাতে থাকে, অন্ডকোষে বীর্য তৈরি হতে থাকে, মাঝে মাঝে স্বপ্নদোষ হয় অর্থাৎ রাতে ঘুমের মধ্যে লিঙ্গ দিয়ে বীর্য উপছে পড়ে, নিজকে মেয়েদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়, বীরত্ব দেখাতে পছন্দ করে, বিপরীত লিঙ্গের (মেয়েদের) প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, যৌন আকাংখার সৃষ্টি হয়, নিজকে বড় ভাবতে শুরু করে, নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অনেকে আবার নিজকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে ইত্যাদি।

কৈশোর কৌতূহলের বয়স। এ সময়ে নিজেদের শরীর, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করতে পারে। এ সময় কিছু জানতে ইচ্ছে করলে বা কোন সমস্যায় পড়লেও বাবা-মা বা বড়দের সাথে এ ব্যাপারগুলো আলাপ করতে অস্বস্তি বোধ করে এবং সমবয়সি বা বন্ধুদের আলোচনা করতে সাচ্ছন্দ বোধ করে। এ বন্ধুরা যেহেতু তাদেরই সমবয়সি তাই তাদের কাছ থেকে সবসময় সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

তোমাদের মত কিশোরীরা, যাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে হাজারো প্রশ্নের জমা হয়ে আছে তার উত্তর জানতে এ পুস্তিকা তোমাদের সহায়তা করবে এবং তোমাদের মনের কৌতুহল মেটাবে বলে আশা করি।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। শারীরিক কাঠামো মজবুত, দৃঢ় ও বর্ধিষ্ণু হয় বলে এ সময় অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং বিশেষ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন বজায় রাখার জন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় নজর দেয়া দরকার হয়। এ জন্যই প্রতিদিনই কিশোর কিশোরীদের সুষম খাদ্য গ্রহণ করা জরুরী।

পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য:

এখন বলতে পার সুষম খাদ্য কি?

সুষম খাদ্য বলতে দেহের চাহিদা অনুযায়ী অধিক আমিষ ও শর্করা যুক্ত এবং অন্যান্য খাদ্য উপাদানের যথার্থ উপস্থিতিযুক্ত খাবারকেই বোঝানো হয়েছে। এ সময় কিশোরীদের লৌহ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। সাধারণভাবে খাদ্যের ০৬ টি উপাদানই যথা- আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবন ও পানি সম্বৃদ্ধ খাদ্য দেহের চাহিদামত নির্বাচন করেই খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় পুষ্টির অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে।

তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার যেমন- ডাল, ছোট মাছ, শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, দুধ, মাংস, গুড় ইত্যাদি খেতে হবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহনের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমানে নিরাপদ পানি পান করা এবং সেই সাথে নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খেলাধুলা করা দরকার। কৈশোরে শরীরের যথাযথ বৃদ্ধি ও সুস্থ খাবারের জন্য পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর

ও সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হয় এবং শরীর রোগ প্রতিরোধক শক্তি সঞ্চয় করে। পুষ্টি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করা থেকে শুরু করে খাদ্য পরিপাক ও শোষিত হয়। অর্থ্যাৎ পুষ্টি বলতে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলাফলকে বোঝায়।

পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের শ্রেণি বিভাগ:

ক. শক্তিদায়ক খাবার:

- শ্বেতসার বা শর্করা সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, গুড়, আলু, মধু ইত্যাদি। শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরে কাজ করার শক্তি জোগায়। দেহে শর্করার অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, কাজ করার মতো শক্তি থাকে না।
- তেলসমৃদ্ধ স্নেহ জাতীয় খাবার যেমন: তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। শর্করা জাতীয় খাদ্যের মতো স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে কাজ করার শক্তি জোগায়, দেহে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। কাজ করার শক্তি থাকে না।

খ. শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূবরক খাবার:

- প্রাণিজ আমিষ: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ও দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি।
- উদ্ভিদ আমিষ: বিভিন্ন ধরণেরডাল, সয়াবিন, বাদাম, সীমের বীচি, মটরশুঁটি, তৈলবীজ (তিল/সরিষা) ইত্যাদি।

আমিষ খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে। বাড়ন্ত বয়সে শরীরে আমিষের অভাব হলে দেহ গঠন ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

গ. রোগ প্রতিরোধক খাবার:

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও খণিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার যেমন: গাঢ়, রঙ্গিন শাক-সবজি, বিভিন্ন ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ রাখে। নানারকম ভিটামিনের অভাবে নানারকম সমস্যা হয়।

ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। ভিটামিন 'বি' এর অভাবে মুখে ও জিহবায় ঘা হয়। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে দাঁতের মাড়ির অসুখ হয়। মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত ঝরে। শরীরে ভিটামিন 'ডি' এর অভাব হলে হাড় শক্ত হয় না, বেঁকে যায়। ভিটামিন 'ই' এর অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। ভিটামিন 'কে' এর অভাবে এর অভাব হলে কোথাও কেটে গেলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

খনিজ লবণ: দেহের সুস্থতার জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশক। শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদিতে খনিজ লবণ থাকে। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, শরীর বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব দেখা দেয়। আয়রণের অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

ঘ. পানি ও তরল খাবার:

- সকল ধরণেরতরল পানীয় যেমন: বিশুদ্ধ পানি, দুধ, ডাবের পানি, ভাতের মাড়, ডালের পানি, শরবত ইত্যাদি। খাবার হজম করতে পানি দরকার। পানির সাথে দেহের বিষাক্ত বর্জ্য মলমূত্র আকারে বের হয়ে যায়। পানি কম পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

অনেক সময় শরীর অসুস্থ এবং দুর্বল লাগে কেন?

অনেক কারনে তোমাদের শরীর দুর্বল লাগতে পারে। এর মধ্যে রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগ অন্যতম। পরিমিত পরিমাণে ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেয়া ও ব্যায়াম করার পরেও অসুস্থ বা দুর্বল লাগলে ডাক্তারে পরামর্শ নেয়া উচিত হবে। একই সাথে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা বয়ঃসন্ধিকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সময় শরীরে ঘাম বেশি হয় এবং চামড়া তেলতেলে হয়। শরীরের ঘামে, বা কাপড়ের নিচে ঢেকে থাকা অঙ্গে কিছুটা দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হাত, পা, চোখ,কান, নাক, চুল, নখ যেমন প্রতিদিন পরিষ্কার রাখা দরকার তেমন ভাবে শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢাকা থাকে, প্রতিদিন সেগুলোও পরিষ্কার রাখতে হয়। এজন্য প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করা, যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখা, হাত-মুখ ধোয়া, পরিষ্কার কাপড় পরা এবং পরিষ্কার জিনিস ব্যবহার করা দরকার।

ছোটবেলায় মুখে ব্রণ ছিল না, বড় হলে কেন ব্রণ হয়?
বিশেষ করে ১২ বছরের পর থেকে ছেলে বা মেয়েদের মুখে ব্রণ দেখা যায়। এর প্রতিকার কী?

কারো কারো মুখে এ সময় ব্রণ বা দানা দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ব্রণ আকারে ছোট হয় এবং এমনিতেই চলে যায়। ব্রণে হাত দেয়া উচিত নয়। এ বয়সে ব্রণ হবার মূল কারণ শরীরে হরমোনের পরিবর্তন। তাছাড়া মানসিক দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অতিরিক্ত চা, কফি ও ধূমপান করার কারণেও ব্রণ হতে পারে। মুখ তেলতেলে থাকলে ব্রণ হয়। প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি খেলে, বেশি করে পানি পান করলে এবং মুখমন্ডল পরিষ্কার রাখলে ব্রণ কম হয়। অল্প পরিমান সাবান দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ ধুয়ে ভালোভাবে মুছে ফেলবে। নখ দিয়ে কখনও ব্রণ খুঁটবে না। ব্রণ থেকে বেশি দাগ হয়ে গেলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবে।

তোমার দেহ

তোমাদের বয়সি ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেহ সম্পর্কে কৌতুহল থাকে। দেহের ভিতরে কি আছে তা তোমরা জানতে চাইতে পারো। নিজের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই।

তোমরা জানো নতুন একটি শিশু পৃথিবীতে আসার জন্য নারী ও পুরুষ দু'জনেরই প্রয়োজন। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম হওয়ার জন্য এই পুরো প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গগুলো জড়িত সেগুলোকে একসাথে প্রজননতন্ত্র বলা হয়।

নারী ও পুরুষভেদে প্রজননতন্ত্রকে মেয়েদের প্রজননতন্ত্র এবং ছেলেদের প্রজননতন্ত্র বলা হয়।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র (* ছবি লাগবে):

প্রজননতন্ত্র হচ্ছে সেই সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি যেগুলো সন্তান উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মেয়েদের প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১। বহিঃপ্রজনন অঙ্গ-যা বাইরে থেকে দেখা যায়
২। অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ-যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলো অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে একটি অংশ বাইরে থেকে দেখা যায়, যেমন - যোনি। কিছু অংশ যা ভিতরে রয়েছে, তা বাইরে দেখা যায় না, যেমন-মেয়েদের তলপেটের দুই পাশে দু'টি ডিমের থলি আছে। এই ডিমের থলি দু'টিকে ডিম্বাশয় বা ওভারি বলে। প্রতিটি মেয়ে যখন বড় হয় তখন প্রত্যেক মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম পরিপক্ক হয়।

দুই ওভারির মাঝখানে, তলপেটের দিকে একটি জরায়ু আছে। এ জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয় এবং শিশু বড় হয়। জরায়ুর উপরের দিকে দুই পাশ থেকে দুটি নালী শুরু হয়ে ওভারি বা ডিমের থলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালী দুটিকে ডিম্ববাহী নালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলে। প্রতি মাসে ডিমের থলিতে যখন একটি করে ডিম পরিপক্ক হয় (ব্যতিক্রমি ক্ষেত্রে একাধিক), তখন তা এই নালী দিয়ে জরায়ুতে আসে।

জরায়ুর নিচে মেয়েদের যোনিপথ আছে। এ যোনিপথ বাইরে এসে যোনিপথের মুখ হিসেবে শেষ হয়েছে। মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনিপথের মুখ ছাড়াও আরো দুটি ছিদ্রপথ আছে। যোনিপথের সামনের ছিদ্রটি মূত্রনালীর মুখ, যার মাধ্যমে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে। যোনিপথের পিছনের ছিদ্রটি পায়ুপথের মুখ, যার মাধ্যমে মলত্যাগ করা হয়।

এ যোনিপথের অনেকগুলো কাজ রয়েছে। যেমন- প্রতিমাসে মাসিকের রক্ত এ পথ দিয়ে বের হয়। এ পথে যৌনমিলন হয় এবং এ পথেই একটি শিশু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আসে।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্র:

ছেলেদের দেহের নিচের দিকে লিঙ্গের গোড়ায় একটি ঝুলন্ত থলি আছে, যাকে অন্ডকোষের থলি বলে। এ থলির ভিতরে দু'টি গোলাকার অন্ডকোষ বা টেস্টিস ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি ছেলে যখন বড় হয় তখন এ অন্ডকোষ থেকেই শুক্রাণু তৈরি হয়। শুক্রাণু তৈরির এ প্রক্রিয়া সারাজীবন চলতে থাকে। যৌনমিলনের ফলে ছেলেদের বীর্য নির্গত হয়। বীর্যের মধ্যে থাকা অসংখ্য শুক্রাণু

মেয়েদের জরায়ুতে গিয়ে পড়ে এবং একটি মাত্র শুক্রানু ডিম্বানু বা ডিমের সাথে মিলিত হয়ে সন্তানের সৃষ্টি হয়। ব্যতিক্রমি ক্ষেত্রে মেয়েদের জারায়ুতে একাধিক পরিপক্ক ডিম্বানু চলে আসলে সেগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি শুক্রানুর সাথে মিলিত হয়ে একাধিক সন্তান সৃষ্টি করে।

মেয়েদের বেড়ে ওঠা: শারীরিক

মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন কখন থেকে শুরু হয়? মেয়েদের এ ধরণেরপরিবর্তন কেন হয়?

যখন একটি মেয়ে ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। এই বয়সে মেয়েদের দেহে হরমোন তৈরি হয়। হরমোনের কারণে মেয়েদের শরীরে নানা ধরণেরপরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন- উচ্চতা বাড়ে, স্তন বড় হয়, বগলে ও যৌনাঙ্গে লোম গজায়, মাসিক শুরু হয় ইত্যাদি। এই পরিবর্তনগুলোই হচ্ছে একটি মেয়ের বড় হয়ে ওঠার স্বাভাবিক লক্ষণ।

মাসিক বা ঋতুস্রাব:

'মাসিক',ঋতুস্রাব', 'পিরিয়ড', 'ঋতু' শব্দগুলো যেন এক একটি নিষিদ্ধ শব্দ। বাহ্যিকভাবে আমরা খুবই আধুনিক। অথচ, স্বাভাবিক ও অতি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেই আমরা সেকেলে বা ব্যাকডেটেড হয়ে যেতে পছন্দ করি। নিজেদের আধুনিকতার মোড়কে ঢেকে রাখলেও 'ঋতুস্রাব', 'মাসিক' বা 'পিরিয়ড' শব্দগুলো যেন বেশ অস্বস্তিতেই ফেলে আমাদের। তবে অস্বস্তি করে স্বাভাবিক বিষয়টিকে না জানলে কিন্তু চলবে না। তোমাদের নিজেদের সুস্থতার জন্যই সবটা জানতে হবে।

মাসিক বা ঋতুস্রাব মেয়েদের দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ। সাধারণত ১২-১৩ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। তবে কারো কারো এ আগে বা পরেও হতে পারে। ৪৫-৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিমাসেই মাসিক হয়ে থাকে। মাসিকের প্রথম দিন থেকেই ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি হতে শুরু করে। মাসিক হওয়ার পরে মেয়েরা প্রজনন অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। তাই মাসিক নিয়ে ভয় বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

মাসিক কেন হয়?

মেয়েরা যখন বড় হয় তখন প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়ে ডিম্ববাহী নালীতে আসে। একই সময় জরায়ুতে রক্ত ভরা নরম পর্দা তৈরি হয়। যদি এ সময় যৌনমিলন হয় তাহলে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রুণ তৈরি হয়। এই ভ্রুণ রক্তে ভরা নরম পর্দায় গিয়ে বসে ও ধীরে ধীরে বড় হয়ে শিশুতে পরিণত হয়।

যদি শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলন না হয়, তাহলে এই পর্দার আর প্রয়োজন হয় না। তখন এই রক্তে ভরা পর্দা প্রতি মাসে জরায়ু থেকে যোনীপথে রক্তস্রাব আকারে বের হয়ে আসে, একে মাসিক ঋতুস্রাব বলে। কোনো আঘাত বা অসুখের কারণে এই রক্ত পড়ে না। এ বয়সে একটি মেয়ে যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছে, মাসিক তারই প্রমাণ।

পিরিয়ড বা মাসিক কয়দিন হয়?

স্বাভাবিক অবস্থায় মাসিক প্রতিমাসেই হয়ে থাকে এবং তা ৩ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। মেয়েদের প্রতি ২৪ থেকে ৩২ দিন অর্থাৎ গড়ে ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। একে মাসিকচক্র বলে। মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই মাসিকচক্র শুরু হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে এ ২৮ দিনের চক্রটি কম বা বেশি হতে পারে।

মেয়েদের কেন মাসিক হয়, ছেলেদের কেন হয় না?

মেয়েদের শরীরে জরায়ু থেকে প্রতি মাসে মাসিক হয়। যেহেতু মেয়েদের মতো ছেলেদের জরায়ু নেই, তাই তাদের মাসিক হয় না।

যখন প্রথম মাসিক শুরু হয় তখন হয়তো ভাবো-এ আমার কি হলো?

মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত মেয়েদের ১২-১৩ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। তবে কারো কারো এর আগে বা পরেও হতে পারে। এজন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে মাসিক শুরু হওয়ার আগে এ ব্যাপারে জানা থাকে না বলে প্রথম মাসিকের সময় অনেকেই ভয় পায়। মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন মা অথবা অন্যান্য মহিলা যেমন- বড় বোন, ভাবি তাকে আগে থেকে এ ব্যাপারটা যদি বুঝিয়ে বলেন তবে মেয়েটি লজ্জা ও ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে।

এই রক্ত পড়া কি বন্ধ হবে না? এটা আবার কি ঝামেলা?

অধিকাংশ মেয়েরা মনে করে যে, মাসিক একটি ঝামেলার ব্যাপার, কিন্তু এটি জীবনের একটি বাস্তব সত্য। এই রক্ত পড়া সাধারণত ১২-১৩ বছর থেকে শুরু হয় এবং ৪৫ থেকে ৪৯ বছর সয়সে স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ হয়ে যায়। মাসিকের রক্তের পরিমাণও কম-বেশি হতে পারে। মাসিকের রক্তের পরিমাণ কতটুকু হবে বা কতদিন মাসিক থাকবে তা নির্ভর করে হরেমোন, শারীরিক গঠন, রক্তের পরিমাণ, বংশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর। মেয়েদের প্রথম মাসিক হলে কোনো কোনো সময় তা অনিয়মিত হয়। কোন মাসে হয় আবার কোনো মাসে হয় না। অধিককাংশ মেয়ের ক্ষেত্রে কয়েক বছরের মধ্যে এই অনিয়মগুলো দূর হয়ে যায়। দীর্ঘদিন এই অনিয়ম চলতে থাকলে অবশ্যই একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মাসিকের সময় কীভাবে চলতে হয়? মাসিক হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন কেন?

মাসিকের সময়ে রক্ত যাতে বাইরে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড, পরিষ্কার কাপড় বা তুলা ব্যবহার করতে হয়। এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে করেকবার বদলাতে হয়। এছাড়া নানা মাপের জাংগিয়া বা প্যান্টি পাওয়া যায়। কাপড় বা তুলার সাথে এগুলো ব্যবহার করা যায়। এসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে এবং যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। শরীরের বিভিন্ন অংশের মতো যোনিপথেও স্বাভাবিকভাবেই কিছু জীবাণু বাস করে। এসব জীবাণু থাকার অর্থ কিন্তু সংক্রমণ নয়। তবে যেহেতু পিরিয়ডের সময় রক্ত যাচ্ছে, আর কোথাও রক্ত পড়ে থাকলে তা জীবাণু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, সে কারণেই বিশেষ এই দিনগুলোতে থাকে সংক্রমণের ভয়। এ ছাড়া জরায়ুমুখ মাসিকের সময় খানিকটা খোলা অবস্থায় থাকে (অন্য সময় যা বন্ধ থাকে) বলে যোনিপথ পেরিয়ে ভেতরের দিকেও সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। জরায়ু, ডিম্বনালি, ডিম্বাশয়, এমনকি তলপেটের ভেতরের পর্দায়ও সংক্রমণ হতে পারে। তলপেটের ভেতর পুঁজ জমতে পারে, ডিম্বাশয়-ডিম্বনালির জায়গায় গোটা হতে পারে। তলপেটে ব্যথা, অনিয়মিত রক্তস্রাব, কয়েক দিন পরপরই যোনিপথে রক্তক্ষরণ, এমনকি বন্ধ্যাত্বের মতো সমস্যাও (কম বয়সে এই পরিচ্ছন্নতা মেনে না চললে) হতে পারে। প্রস্রাবে সংক্রমণও হতে পারে।

মাসিকের সময় কিভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন থাকবো?

“সুস্থ থাকতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অবদান অনেক। বিশেষত মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা সুস্থতার অন্যতম নিয়ামক। তাই এ সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি ”। সব জানলে তবেই তো বুঝবে কোন কোন বিষয়ে সচেতন হতে হবে, আর ঠিক কি করতে হবে তোমাদের।

- প্রতিদিন গোসল করতে হবে। শরীরে সাবান ব্যবহার করলেও যোনিপথ বা এর আশপাশে সাবান ব্যবহার করবে না। যোনিপথকে জীবাণুমুক্ত করতে স্যাভলন ব্যবহার করাও অনুচিত;
- প্রতিবার প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিষ্কার পানি দিয়ে যোনিপথ ও এর আশপাশটা ধুয়ে নিতে হবে। অনেক সময় ঊরুতেও রক্ত লেগে যায়। পানি দিয়ে সব জায়গায় লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে যোনিপথের ভেতরে হাত দিয়ে পরিষ্কার করবে না;
- প্রতিবার প্রস্রাব-পায়খানা করার আগে এবং পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেই হাত ধুয়ে নেবে সাবান দিয়ে। মাসিকের সময় ছাড়াও এসব অভ্যাস বজায় রাখতে হবে;
- স্যানিটারি ন্যাপকিন পরিবর্তন বা ব্যবহারের আগেও সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে;
- কেউ কেউ ট্যাম্পুন (তুলা বা স্পঞ্জ দিয়ে তৈরি এমন পদার্থ, যা যোনিপথ দিয়ে ভেতরে রাখা যায় এবং রক্ত শোষণ করে আটকে ফেলে) ব্যবহার করে। এটি এড়িয়ে চলাই ভালো;
- স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে রক্ত ছড়িয়ে পরিধেয় পোশাকেও লেগে যায় কখনো কখনো। এ রকম হলে যত দ্রুত সম্ভব তা বদলে ফেলতে হবে। দাগ লেগে যাওয়া পোশাক পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

মাসিকের সময় কাপড় ব্যবহার করা ভালো, নাকি প্যাড (স্যানিটারি ন্যাপকিন)?

মাসিকের সময় পরিষ্কার তুলা বা প্যাড ব্যবহার করাই ভালো। তবে তা সম্ভব না হলে পরিষ্কার শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাসিকের সময় কাপড় বা প্যাড না ব্যবহার করলে মাসিকের রক্ত কাপড় বা বিভিন্ন জায়গায় লেগে যেতে পারে। এটি একদিকে যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি বিব্রতকর। সারা দিনে তিন চার বার স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড বদলাতে হতে পারে। তবে কম রক্ত যাচ্ছে বলে সারা দিন এক প্যাড পরে থাকবে, এ রকম করা যাবে না কখনোই।

স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাডের পরিবর্তে কখনো টিস্যু পেপার ব্যবহার করবে না। প্যাডের ওপরে টিস্যু পেপারের বাড়তি স্তরও দেয়া যাবে না। আর্থিক অসুবিধার কারণে শুধু প্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে মাসের চাহিদা পূরণ করতে না পারলে প্যাডের ওপর তুলার স্তর দেয়া যেতে পারে। এমন হতে পারে যে তুলার স্তর পাল্টে পাল্টে সারা দিনে হয়তো মাত্র একটি প্যাড ব্যবহার করলেই চলছে। তবে

প্যাডে কোনোভাবে যদি রক্ত লেগেই যায়, তাহলে তা বদলাতে হবে। মোটামুটি ছয় থেকে আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রক্ত লাগা প্যাড বা তুলা কোনোটাই রাখা যাবে না। কাপড় পরিবর্তনের সময়কালও একই।

মাসিকের কাপড় কিভাবে ব্যবহার করবো?

মাসিকের সময় পরিষ্কার প্যাড ব্যবহার করা সম্ভব না হলে পরিষ্কার শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তা পরিষ্কার ও শুকনো থাকা জরুরি। কাপড় প্রতিবার ব্যবহারের পরে ভালোভাবে সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। কারণ কড়া রোদে শুকালে রোগ জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে না। কোনভাবেই অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে শুকানো যাবে না। তা না হলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকবে। কাপড়, তুলা বা প্যাড যেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রয়োজন মতো তা পরিবর্তন করতে হবে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি বার, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে কম বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।

মাসিকের সময় পেট ব্যথা করে কেন? মাসিকের সময় পেট ব্যথা করলে কি করবো?

মাসিকের সময় কারো কারো কোমরে বা পেটে অল্প অল্প ব্যথা হতে পারে। শরীরের এক বিশেষ হরমোনের জন্য মাসিকের সময় জরায়ুর সংকোচন (ছোট হওয়া) ও প্রসারণ (বড় হওয়া) ঘটে। ফলে তলপেটে বা কোমরে ব্যথা অনুভূত হয়। তাছাড়া প্রথম প্রথম মাসিক হলে মেয়েরা অস্বস্তিতে ভুগতে পারে। এ সময় বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম বা গরম সেক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তবে স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হলে, বেশি ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

মাসিক হলে চলতে ফিরতে বাঁধা দেয়া হয় কেন?

মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। মাসিক হলে স্বাভাবিক চলা ফেরায় কোনো বাঁধা নেই। তাই এ সময় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

মাসিক হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায় কেন?

স্বাভাবিকভাবে মাসিকের সময় শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যায়। কেউ যদি আগে থেকে অপুষ্টিতে ভোগে তাহলে এই রক্ত বের হয়ে যাওয়ার ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে, ফলে শরীর দুর্বল বা ক্লান্ত লাগতে পারে। মাসিকের সময় মাছ, মাংস, ডিমসহ সব ধরণেরপুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তবে খুব বেশি রক্ত গেলে বা শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে দেরি না করে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মাসিকের সময় কি কি কাজ করা যাবে না? মাসিকের সময় কি দৌড়-ঝাঁপ বা ভারি কাজ করা যায়?

মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সময় স্বাভাবিক সব কাজ করা যায়। মাসিকের সময় প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরতে থাকে, তাই কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করতে হয়। এ সময় জরায়ুর সংকোচন-প্রসারণ হতে থাকে, তাই বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে বা ভারি কাজ করলে জরায়ুর ওপর চাপ পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে মাসিকের রক্ত ঝরার পরিমাণ বেশি হতে পারে এবং পরার কাপড়ে রক্ত লেগে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাই বেশি দৌড়-ঝাঁপ বা ভারি কাজ না করাই ভালো। এ সময় দৈনন্দিন স্বাভাবিক চলাফেরা এবং পারিবারিক সব কাজ করা যাবে।

"মাসিক (মিনস্) হলে অসস্তি লাগে, ভালো লাগে না, চলাফেরা করতে মন চায় না কেন? এক জায়গায় বসে থাকতে ইচ্ছা করে"- এ রকম লাগে কেন?

প্রথম প্রথম মাসিক বা মিনস্ হলে একটু অস্বস্থি লাগতে পারে এবং চলাফেরা করতে ও সবার সামনে যেতে বিব্রতবোধ হতে পারে। তবে মানসিকভাবে এই শারীরিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে হবে। প্রথম দিকে একটু সমস্যা হলেও আস্তে আস্তে তা কেটে যাবে।

মাসিকের সময় কোমরে বা তলপেটে ব্যথা অথবা মাথাব্যাথা হলে কি করা উচিত?

মাসিকের সময়ে অনেকের কোমরে বা তলপেটে ব্যথা অথবা মাথা ব্যথা হতে পারে। বিশ্রাম ও গরম সেক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে বোতলে গরম পানি নিয়ে সেক দিলে আরাম পাওয়া যায়। তবে এ সময়ে ব্যাথা বেশি হলে বা স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ও প্রয়োজনে ঔষধ খেতে হবে।

মাসিকের সময় কি মাছ-মাংস খাওয়া, টক খাওয়া এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে?

মাসিকের সময় মাছ, মাংস, ডিম তথা পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যাবে না-এটি একবারেই ঠিক নয়। বরং এই সময় বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে, আয়রনসমুদ্ধ খাবার খেতে হবে। তা না হলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। অনেকে মনে করে মাসিকের সময় টক জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না-এটি সম্পূর্ন ভুল ধারণা। কেননা লেবু, কমলা, তেঁতুল, আমলকি, জলপাই ইত্যাদি টক খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরে আয়রন-এর শ্বসন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। কোনো খাবারই মাসিকের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না। কৈশোর শরীর গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর শরীর গঠনে সাহায্য করে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার। সুতরাং এ বয়সে বিশেষ করে মাসিকের কারণে কোনো খাবার বেছে খাওয়া বা বাদ দেয়া উচিত নয়।

মাসিকের সময় কি বাইরে গেলে বা চুল খোলা রাখলে জ্বীন-ভূতের আছর বা খারাপ বাতাস লাগতে পারে?

মাসিকের সময় বাইরে গেলে বা চুল খোলা রাখলে জ্বীন-ভূতের আছর বা খারাপ বাতাস লাগতে পারে-এটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারনা। এসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি আলো বাতাস ও খোলামেলা স্থানে বের হওয়া আবশ্যক। তা বাড়ি উঠোন, বাড়ির ছাদ বা খেলার মাঠও হতে পারে। এমনকি স্কুলে যাওয়া এবং খেলাধূলাসহ স্বাভাবিক সকল কাজকর্মও করা যাবে। এতে শরীর ও মন উভয় ভালো থাকবে। এসময় অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে থাকা মোটেই ঠিক নয়।

মেয়েদের মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেমন-

- মাসিক চলাকালে মেয়েরা দূষিত বা অপবিত্র হয়ে যায়;
- এ সময়ে বাড়ির বা ঘরের বাইরে গেলে জ্বীন-ভূতে আছর করবে;
- এ সময়ে টক খাওয়া যাবে না, খেলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হবে;
- এ সময়ে মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, খেলে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হবে;
- মাসিক চলাকালে স্বামীর সাথে এক বিছানায় ঘুমানো যাবে না;
- স্বামী বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে খাবার তুলে দেয়া যাবে না;
- মাসিক চলাকালে গোয়ালঘরে যাওয়া যাবে না এবং
- চুল ছেড়ে বসতে বা চলাফেরা করতে পারবে না

যোনিপথে সাদা স্রাব নির্গত হয় কেন? এ ধরণেররোগ হলে কি করবে? এর কি চিকিৎসা দরকার?

মেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে তখন তাদের যোনিপথ থেকে এক ধরণেরস্বচ্ছ সাদা বা হালকা হলদে স্রাব বের হতে শুরু করে। স্রাবের পরিমাণ কোনো মেয়ের কম, আবার কোনো মেয়ের বেশি হতে পারে। যোনিস্রাব বের হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্বাভাবিক নিয়মেই স্রাবের পরিমাণ কখনো বাড়ে বা কখনো কমে। স্রাব কখনও শুষ্ক ও আঠালো, আবার কখনও ভেজা ও পাতলা হতে পারে। যেহেতু যোনিপথে স্রাব হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার তাই এর জন্য চিন্তিত হবার বা চিকিৎসা নেবার কোনো দরকার নেই।

তবে যোনিপথে বা জরায়ুতে কোনো সংক্রমণ হলে প্রচুর পরিমানে গন্ধযুক্ত সবুজ বা হলুদ স্রাব বের হয়। অনেক সময় এর সাথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ইভটিজিং বা উত্ত্যক্ত করা

উত্ত্যক্ত করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার? এটা কি আসলেই মজা করা?

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে যা তাদেরকে পুরুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তোমরা হয়তো জানো যে, ছেলেরা, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও রাস্তাঘাটে মেয়েদের কিংবা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। কোনো কোনো সময় মেয়েরাও ছেলেদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে এক ধরণেরযৌন নিপীড়ন। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী উত্ত্যক্ত করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কেউ উত্ত্যক্ত করলে কি করবে?

- রাস্তাঘাটে কেউ তোমাকে উত্ত্যক্ত করলে ভয় পাবার কিছু নেই;
- যদিও ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর। তারপরও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ;

- স্কুলে কিংবা অন্য কোথাও আসা-যাওয়ার সময় কয়েকজন মিলে একসাথে চলার চেষ্টা করবে;
- মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখবে;
- এ ধরণের পরিস্থিতি কৌশলে মোকাবেলা করবে, যাতে উত্ত্যক্তকারী আরো বেশি প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে উঠতে পারে;
- যদি সমস্যা গুরুতর হয় বা নিজের আয়ত্বের বাইরে চলে যায় সেক্ষেত্রে তোমার মা-বাবা এবং শিক্ষকদের জানাবে এবং
- প্রয়োজনে আইনের সহায়তা নেবে।

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন কি?

অনেক সময় কিশোরী তথা মেয়েদেরকে রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অশোভন ও অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হতে হয়। একে যৌন নিপীড়ন বলে। যৌন নিপীড়ন অনেকভাবেই হতে পারে। আজকাল তথ্য প্রযুক্তি যেমন-মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ইত্যাদি অপব্যবহার করেও অনেককে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হয়।

কেন মেয়েরাই যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়?

নারী-পুরুষ যে কেউ যেকোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা, যথাযথ শিক্ষার অভাব এবং মেয়েদের সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অজ্ঞতা থেকে আকর্ষণের কারণেই মেয়েরাই বেশি যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়। তবে শিশু, কম বয়সি মেয়ে বা ছেলে এই অবস্থার মুখোমুখী হয় বেশি। দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশি, আত্নীয়-স্বজনেরাই যৌন নিপীড়ন করে থাকে। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সি মেয়েদের ভয়, প্রলোভন, চাপ বা হুমকি দেয় এ ধরণেরঘটনা কাউকে না বলার জন্য। কিন্তু এ রকম হলে চুপচাপ না থেকে বা ভয় না পেয়ে অভিভাবক বা বড় কাউকে বলা উচিত এবং সেই সাথে সমবয়সি ও পরিচিতদেরও তার (যৌন নিপীড়নকারী) সমন্ধে বলে দেয়া উচিত, যেন তারাও তার সমন্ধে সাবধান থাকতে পারে। মনে রাখবে, যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, যাকে করা হয় তার কোনো দোষ নেই।

যৌন নিপীড়নের কি কোনো প্রতিকার নাই?

যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একা একা কারো সাথে মেলামেশা না করে বা বেড়াতে না গিয়ে কয়েকজন মিলে যাওয়া উচিত। এছাড়া যৌন নিপীড়ন করে এমন কারো সমন্ধে জানা থাকলে বা সে রকম সন্দেহ থাকলে তার সাথে একা গল্প করবে না বা বেড়াতে যাবে না।

যৌন নিপীড়নের শিকার মেয়েটির জন্য কি করা দরকার?

অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক মেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট পায়, আত্নবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ রকম ঘটনার শিকার হয় তবে এ অবস্থায় তাকে সন্ত্বনা দেবে, সমবেদনা জানাবে যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব সময় মনে রাখবে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একটি ঘৃণ্য অপরাধ। এ ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার মেয়েটির দোষ নেই। যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, তার সমন্ধে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হয়ে চলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধরণেরযৌন নিপীড়নকারীদের জন্য দেশের প্রচলিত আইনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে

- আগ বাড়িয়ে কেউ বেশি আপনভাব দেখালে, সাহায্য বা উপকার করতে আসলে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করবে;
- কাউকে ভালো লাগলে চট করে তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলবে না;
- অচেনা কোনো নারী বা পুরুষের সাথে একা চলাফেরা করবে না;
- কারো আচারণ বা কোনো কিছু অস্বস্তিকর মনে হলে তার সামনে কখনো একা যাবে না বা থাকবে না;
- বিপরীত লিঙ্গের সমবয়সি, বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশিদের কাছ থেকে, বিশেষ করে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে সাবধানে থাকবে;
- একা একা চলাফেরা না করে যতদূর সম্ভব দল বেঁধে চলাফেরা করবে;

- কোনো দ্বিধা, প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে। কেউ যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষন করলে বা এ অবস্থার মুখোমুখী হলে চুপচাপ না থেকে অভিভাবককে জানাবে;
- পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয় স্বজন সবাইকে যৌন নিপীড়নকারীর কথা জানিয়ে দেবে যাতে সবাই তার কাছ থেকে সাবধানে থাকে।

আমার এক বান্ধবীর গায়ে তার এক শিক্ষিত আত্নীয় হাত দিয়েছিল। শিক্ষিত হয়েও সে এ কাজ কেন করলো?

তোমাদের মতো অনেক মেয়েদেরই এ ধরণেরসমস্যায় পড়তে হয়। এ ধরণের আচরণ হচ্ছে এক ধরণের যৌন নিপীড়ন। যে কোনো ধরণের আচরণ, কথা বা শারীরিক ছোঁয়া-তা যার দ্বারাই হোক না কেন, যদি অস্বস্তিকর হয়, তবে তাকে যৌন নিপীড়ন বলা যেতে পারে। এ ধরণের যৌন নিপীড়ন যেকোন জায়গায় যেমন-রাস্তাঘাটে, বাসে, কর্মক্ষেত্রে এমন কি বাসায়ও হতে পারে। নৈতিকতাহীন অনেক শিক্ষিত মানুষও এ ধরণের নিপীড়ন করতে পারে।

অনেক সময় নিকট আত্নীয় বা আপনজনও যৌন নিপীড়ন করতে পারে। অল্পবয়সি মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার বেশি হয়। যারা যৌন নিপীড়ন করে তারা অনেক সময় নানা ধরণের ভয় দেখায় যাতে এ ব্যাপারটা অন্যরা জানতে না পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা না করে অভিভাবক বা বড় যাদের সাথে সহজে কথা বলা যায়, তাদের জানানো উচিত। এটা কোনো মতেই চুপচাপ সহ্য করা উচিত নয়। যৌন নিপীড়ন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করবে?

- তাকে জানিয়ে দাও যে, তুমি এসব পছন্দ করো না এবং ব্যাপারটি অন্য কাউকে বলে দেবে;
- তোমার বড় ভাই-বোন বা বাবা-মাকে এ সম্পর্কে জানাও;
- ঐ মানুষটির সাথে আর কখনো একা হবে না;
- সে অন্য কাউকে বলে দেবে বলে ভয় দেখালেও তার কথায় বিশ্বাস করবে না এবং
- এ ব্যাপারে নিজেকে কখনো দোষী ভাববে না।

বাল্যবিবাহ-এর কুফল ও করণীয়:

বাল্যবিবাহ কি?

বিবাহের সময় বরের বয়স যদি ২১ বছরের নিচে বা কনের বয়স ১৮ বছরের নিচে হয় তখন তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়।

এছাড়া বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিবাহর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সের কম হলে অর্থাৎ বিবাহতে বর-কনে উভয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের নিচে অথবা মেয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে বা ছেলের বয়স ২১ বছরের নিচে থাকলে সেটা আইনের দৃষ্টিতে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত হবে যা আইনত দন্ডনী অপরাধ।

বাল্য বিবাহকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র আর সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে, বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যা, যার প্রতিকার প্রয়োজন। বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ এমন একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা যা নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। বাল্যবিবাহের উৎপত্তি সমাজের অনেক গভীরে এবং বিভিন্ন ধরণেরঅর্থনৈতিক বিষয়, সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ও নানা প্রকার ধ্যান-ধারণা এর ভিত্তি।

বাল্যবিবাহর কারণ:

- **বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে অজ্ঞনতা ও সচেতনতার অভাব:**

  বিবাহ আইন সম্পর্কে ধারণা কম থাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব।

- **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় কুসংস্কার:**

  কখনো কখনো ভালো বর/পাত্র পেলেও বাবা-মায়েরা আগে বিবাহ দিয়ে দেন। মনে করেন এতো ভাল পাত্র পরে না-ও পেতে পারেন। কখনো কখনো সামাজিক চাপে পড়ে বাবা-মা অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ দেন।

- **দারিদ্র্যতা ও আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপট:**

  দারিদ্র্যতার কারণেও অনেক বাবাব-মা অল্পবয়সে মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়ে দেন। সাধারণত বরপক্ষ কম বয়সী মেয়েকে পাত্রী হিসেবে বেশি পছন্দ করে এবং যৌতুক কম চায়। দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে পিতা-মাতা কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা হিসেবে দেখে তাই তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় মুক্ত হতে চায়।

- **সঠিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব:**

  কিছু কিছু অভিভাবক মনে করেন, মেয়েদের বয়স বেশি হলে বিবাহর জন্য ভালো পাত্র পাওয়া যাবে না। এছাড়াও বাল্যবিবাহর পরিণতি ও কম বয়সের গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকা।

- **সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা:**

  আমাদের সামাজে অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদেরকে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এ জন্য উপযুক্ত পাত্র পেলেই তারা মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেন। তারা মনে করেন মেয়েদের বিবাহ দিলে সন্ত্রাসী বা বখাটে ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

- **জেন্ডার বৈষম্য:**

  সামাজিক প্রথাতগতভাবে পিতা-মাতা মনে করেন কন্যা সন্তান বড় হয়ে শশুর-বাড়ি চলে যাবে এবং পিতা-মাতার দেখাশুনা করতে পারবে না। ছেলে সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার দেখাশুনা করবে। ফলে ছোট বেলা হতেই কন্যা সন্তান বৈষম্যের শিকার হয় এবং যত তাড়াতাড়ি পারে বিবাহ দিয়ে দেন।

- **পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার না থাকা:**

  আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার ও সমাজে নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়না বা প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই মেয়ের বিবাহ ঠিক করেন। মেয়েকে বোঝা মনে করেন এবং যত তাড়াতড়ি পারেন অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়ে দেন। মেয়ের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।

  তবে কারণ যাই হোক না কেন, বাল্য বিবাহ একটি আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে সে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে।

বাল্যবিবাহের অপরাধ ও শাস্তি:

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে তিন ধরণেরঅপরাধ সংঘটিত হতে পারে:

১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিবাহ;
২. প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহ এবং
৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক কর্তৃক বিবাহ নির্ধারণ বা বিবাহতে সম্মতি দান।

বাল্যবিবাহ আইনের দৃষ্টিতে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইনে শিশু বিবাহকারীর শাস্তি, বিবাহ সম্পাদনকারীর শাস্তি, অভিভাবকের শাস্তি-এই তিন ভাগে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহের জন্য শাস্তি পাবেন- শিশু (কন্যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি) বিবাহকারী পুরুষ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারী কাজী এবং অভিভাবকসহ বাল্যবিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাল্যবিবাহের শাস্তি:

- ❖ "প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর কারাদন্ড অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডীয় হইবেন এবং অর্থদন্ডে অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডীয় হইবেন।"
- ❖ "অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরণেরশাস্তিযোগ্য হইবেন।"

বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি:

- ❖ "পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীর উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং দন্ডিত অর্থ অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।"

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি:

- ❖ "কোনো ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন"।

বাল্যবিবাহের বেশ কিছু কুফল :

- কিশোর-কিশোরীদের সহজাত উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধি এবং গতিশীলতাকে থামিয়ে দেয়;
- বিবাহিত কিশোরীরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং লেখাপড়া শেষ করতে পারেনা, ফলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়;
- বাল্যবিবাহর কারণে কিশোরীদের পক্ষে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসমূহের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব তৈরি হয়, যার ফলে নিজস্ব সমস্যা সমাধানে দক্ষতার অভাব থেকেই যায় এবং কোন বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় না;
- বিবাহের পর সন্তান ধারণের জন্য পারিবারিক চাপ বেড়ে যায়, অর্থাৎ বাল্যবিবাহ হলে অবধারিতভাবেই কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ করে থাকে;
- গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে এবং গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়;
- অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান প্রসবের কারণে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়;
- অপরিণত, অপরিপক্ক, অপুষ্ট ও স্বল্প ওজনের শিশুর জন্মদান করে এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে;
- প্রসব ও প্রসব পরবর্তী জটিলতায় ভোগে এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে;
- পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ধারণা থাকে না, যার ফলে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা তৈরি হয়;
- নারীরা অধিক মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়;
- অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থাকে;
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না এবং
- অল্পবয়সি পুরুষ সংসারের দায়িত্ব নিতে না পারায় দাম্পত্য কলহ বাড়ে এবং বহুবিবাহের হার বৃদ্ধি পায়।

কিশোরীদের মাতৃত্বজনিত ঝুঁকি:

কৈশোরে গর্ভধারণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ সময় কিশোরীর নিজেরই শারীরিক বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে, তাই তার পুষ্টিসহ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ তখনও চলতে থাকে। এ অবস্থায় গর্ভধারণ করলে কিশোরী মা ও শিশু উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় কিশোরীর সাথে সাথে তার মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তানেরও নানা প্রকার পুষ্টির দরকার হয়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিশোরীর জন্য এ সকল সেবা ও পুষ্টি পাওয়া সম্ভব হয় না।

কৈশোরে সন্তান ধারণ এবং জন্মদানের ক্ষেত্রে মা এবং সন্তান যে ধরণের ঝুঁকিতে থাকতে পারে তা হলো-

- গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপ;
- গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা;
- প্রি-একলাম্পশিয়া;
- বাধাগ্রস্ত প্রসব;
- মৃত সন্তান প্রসব;
- সময়ের আগে সন্তান জন্মদান;
- কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া;
- প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা এবং
- শিশু পরিচর্যার অনভিজ্ঞতা ও বুকের দুধের অপর্যাপ্ততা।

সর্বোপরী বাল্যবিবাহ একটি বেআইনী বিবাহ। তাই বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলেও তা বাতিলযোগ্য। কোন নারীর ১৮ বছর পূর্ণ না হলে এবং তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ হলে তিনি মুসলিম বিবাহ বাতিল আইন ১৯৩৯ অনুযায়ী আদালতে বিবাহ বাতিলের আবেদন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে-

১. মেয়েটি স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন অর্থাৎ সহবাস করে নি এবং

২. মেয়েটির বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এবং ১৯ বছর পার হওয়ার আগে বিবাহকে অস্বীকার করতে হবে।

বাল্যবিবাহ রোধে স্থানীয়ভাবে যারা আইনি সহায়তা প্রদান করেন:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ও পুরুষ মেম্বার।
- পৌরসভার চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার।
- নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

বাল্য বিবাহ এক ধরণের যৌন নির্যাতন, এ বিষয়টি এখনও বিশ্বাস করেনা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ।

জরুরি সহায়তা পাওয়ার জন্য ফোন নম্বর:

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য-১০৯৮
জরুরী পুলিশী সহায়তার প্রয়োজন হলে-৯৯৯
ইভটিজিং বা উত্তোক্তকরণ প্রতিরোধের জন্য-১০৯

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং যৌনবাহিত রোগ ও করণীয়

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ:

অনেক সময় জীবানু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নারী ও পুরুষের প্রজননতন্ত্রের নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসকল সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগ ও অন্যান্য সংক্রমণ। যৌনমিলনের মাধ্যমে যে সকল রোগ ছড়ায় তাকে যৌনবাহিত রোগ বলে। যেমন- সিফিলিস, গনেরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, হারপিস জেনিটালিয়া, এইচআইভি ও এইডস এবং হেপাটাইটিস বি,সি ইত্যাদি।

হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি ও এইডস সহ কিছু যৌনরোগ যৌনমিলন ছাড়া অন্যভাবেও সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, চুমুর মাধ্যমে আসা লালা, ব্যবহৃত পানির গ্লাস বা চায়ের কাপ ব্যবহারের মাধ্যমে, তার ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকেও সন্তানের মাঝে ছড়াতে পারে। যৌনমিলন ছাড়াও অন্যান্য যৌনরোগ যোনি নিয়মিত পরিষ্কার না করলে, মাসিকের সময় অপরিস্কার কাপড় ব্যবহার করলে এবং প্রসব বা গর্ভপাতের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হতে পারে।

নারীদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণ:

যোনিপথে দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা, যোনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া, তলপেটে খুব ব্যথা, কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা, সহবাসের সময় ব্যথা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা না করার ফলাফল:

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে যে সকল জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো:

- সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে;
- সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে;
- মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা থাকে;
- জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে এবং
- যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

জেন্ডার-বৈষম্য ও সচেতনতা

জেন্ডার কি

জেন্ডার একটি ইংরেজী শব্দ। জেন্ডার এর বাংলা শব্দ 'লিঙ্গ' হলেও সাধারণত 'জেন্ডার' শব্দটিই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজের নারীর সমঅধিকার আদায়, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানো ও নারী হিসাবে সুস্থজীবন যাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠাই জেন্ডার এর মূল

উদ্দেশ্য। জেন্ডার বলতে একটি ছেলে ও মেয়ের মাঝের শারীরিক পার্থক্যকে বোঝায় না। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের ভূমিকা, চাল-চলন, অধিকারের যে পার্থক্য তৈরি করা হয় তাকে জেন্ডার বলে। অর্থাৎ নারী পুরুষের সামাজিক পরিচয়, তাদের সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকাই হলো জেন্ডার।

- পরিবার ও সমাজে ব্যক্তি হিসেবে নারী ও পুরুষ কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে;
- প্রতিটি সমাজের নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নিধারিত কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করে তাকে জেন্ডার ভূমিকা বলে। জেন্ডার ভুমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং
- নারীরা সমাজে মূলতঃ তিন ধরণের ভূমিকা পালন করে-প্রজনন ভূমিকা, উৎপাদনমূলক ভুমিকা, সামাজিক ভুমিকা।

জেন্ডার বৈষম্য:

আমরা সাধারণত নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকি ও সেইভাবে আচরণ করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্টি হয় জেন্ডার বৈষম্যের।

দীর্ঘদিনের চিরাচারিত মনোভাবের কারণে আমাদের অনেক আচরণ যে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে তা আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতেই পারি না, আর সেজন্য বুঝতে পারি না যে জেন্ডার বৈষম্য কি।

অথচ, বৈষম্যভিত্তিক এই আচরণ ছড়িয়ে রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে। আর এর টিকে থাকার পিছনে ভূমিকা রাখছে সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও বিভিন্ন প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। এই জেন্ডার বৈষম্য একদিকে যেমন নারীর সমঅধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে, অন্যদিকে তেমনি মারাত্নকভাবে নারীর স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে।

নারী ও পুরুষের এই জেন্ডার বৈষম্য-

- সামাজিকভাবে তৈরি;
- পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে গৃহীত;
- সমাজ ও স্থান ভেদে ভিন্ন এবং
- অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য:

- সমাজের সকল ক্ষেত্র, যেমন- শিক্ষা, খাদ্য, পারিশ্রমিক, স্বাস্থ্যসেবা- এসব পাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার;
- পরিবারে কন্যা সন্তান থেকে পুত্র সন্তানের অধিক মূল্যায়ন;
- পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্য অধিক ও পুষ্টিকর খাদ্যের বরাদ্দ;
- মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ করতে বাবা-মায়ের অনীহা, কেননা বিবাহের পরে মেয়েরা অন্যের বাড়ি চলে যায়;
- মেয়ে সন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করা এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেয়া;
- বিবাহের সময় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে পাত্রপক্ষের যৌতুক দাবী করা এবং যৌতুক আদায়ের জন্য স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন;
- নারীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা;
- মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের গুরুত্বের বিষয়ে পরিবারের অসচেতনতা ও অনীহা;
- বাল্যবিবাহর কারণে কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ;
- নারীর প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কম থাকায় পরিবার ছোট রাখার বা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়ে মতামত প্রদান করতে না পারা;
- নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নেয়ার প্রবণতা;
- সমাজ ও পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকা;
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা প্রমাণে সমান সুযোগ না দেয়া;
- পুরুষদের তুলনায় নারী কর্মীদের কম পারিশ্রমিক দেয়ার প্রবণতা;
- নিজ উপার্জনের উপর নারীদের অধিকার না থাকা;
- নারী পুরুষের মাঝে সম্পদের অসম বন্টন এবং
- নারীর উপর আরোপিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা যা নারীর জন্য অবমূল্যায়নকর ও ক্ষতিকারক ইত্যাদি।

জেন্ডারের এই অসম সম্পর্ক/অবস্থান যখন আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে বৈধ করা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়, অপরিবর্তনীয় প্রথা হিসেবে চালু করা হয়, তখন সেটি বৈষম্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ:

- সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি;
- ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং
- মেয়েদের ছোট করে দেখার মানসিকতা জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করে।

জেন্ডার বৈষ্যমের কারণে নারীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব:

- অসম স্বাস্থ্য সুবিধা;
- পুষ্টিহীনতা;
- রক্তস্বল্পতা;
- অপরিনত বয়সে গর্ভধারণ;
- অধিক মাতৃমৃত্যু;
- প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতা;
- মানসিক অসুস্থতা এবং
- অকাল বার্ধক্য।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ:

এখন ভেবে দেখার সময় দীর্ঘদিনের সংস্কার, অসচেতনতা ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা নারী ও পুরুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক যে ভূমিকাগুলোতে দেখে থাকি এবং সে অনুযায়ী যে আচরণ করি সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত আর কতটা বৈষম্যমূলক। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে যে বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োন তা হলো:

- জেন্ডার বৈষম্য রোধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- সম মর্যাদা, স্বাধীনতা নিয়ে নারী-পুরুষ বেড়ে উঠবে, যার পরিচয় হবে শুধু মানুষ হিসেবে;
- নারী পুরুষ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন না করে মানুষ হিসেবে একই রকম ভূমিকা পালন করবে;
- নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর অন্য সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা;
- পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও চাকুরী, ব্যবসাসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি দক্ষ নারীশক্তি গড়ে তোলা;
- দক্ষতা অনুসারে সকল কর্মকান্ডে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নারীর অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার আইনি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;
- নারীর অধিকার রক্ষায় ধর্মীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা;
- সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন করা;
- পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া;
- নারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করা;
- যে সব প্রথা বা রীতিনীতি জেন্ডার বৈষম্য টিকিয়ে রাখছে তা চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করা এবং
- নারীকে নিজের এবং নারীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

নারী ও পুরুষের প্রচলিত বা গতানুগতিক ভূমিকাগুলো দূর করে সমতা এবং ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

সমতা: সমতা বলতে সাধারণত সমঅবস্থাকে বুঝায়। সমতা হচ্ছে সমভাবে বন্টন অর্থাৎ প্রাপ্তি, দায়িত্ব পালন, সুযোগ-সুবিধা লাভ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা। যেমন: চাকুরীর বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সকলই আবেদন করার সুযোগ পাবে।

ন্যায্যতা: প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন অর্থাৎ প্রাপ্তি, দায়িত্ব পালন, সুযোগ-সুবিধা লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ন্যায্যতা।

জেন্ডার সমতা:

- জেন্ডার সমতা হচ্ছে দৃশ্যমান সমতা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে এবং জনসম্মুখে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন নির্দেশ করে;
- জেন্ডার সমতা নারী এবং পুরুষ এক- তা মনে করে না, নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার সমান হবে;
- দায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা, আচরণ, মূল্যায়ন নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়ার উপর নির্ভর করে না;
- পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেয়া।

সাম্য ও সমতার পার্থক্য:

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীরা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তাই পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাম্যের (Equity) মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Equality) আনতে হবে।

সঞ্চয়

সঞ্চয় কি এবং কেন সঞ্চয় করবো?

সঞ্চয়: সঞ্চয় আমাদের কাছে অতি পরিচিত একটি শব্দ। আমরা যদি ১০০ জন মানুষকে জিজ্ঞাসা করি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে কি না, তবে ৯৯ জনই বলবে অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা কত জন নিয়মিত সঞ্চয় করি বা করতে পারি?

আর যদি জ্ঞিজাসা করি, সঞ্চয় কি? এক কথায় উত্তর দেবে, "আমি যা জমা রাখি সেটাই সঞ্চয়"।

আসলেও তাই। আমাদের আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা হয়, তাকে সঞ্চয় বলে। মনে করো একজন ব্যক্তির মাসিক আয় ৩৫,০০০ টাকা। তা থেকে তিনি ৩০,০০০ টাকা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করেন এবং অবশিষ্ট ৫,০০০ টাকা ভবিষ্যতের জন্য জমা রেখে দেন। এই ৫,০০০ টাকাই তার মাসিক সঞ্চয়।

অর্থাৎ, **আয় - ব্যয় = সঞ্চয়**।

সঞ্চয়ের গুরুত্ব: আমরা জানি সঞ্চয় করা ভালো। কিন্তু বিপদের সময় দেখা গেল আমাদের হাতে কানাকড়িও নেই, এই জানা থেকে না জানাই ভালো। সঞ্চয়ের গুরুত্ব জানলেই হবে না, এই জানাকে যখন কাজে লাগানো যায় তখনই আসে গুরুত্ব জানার সার্থকতা।

কোন বয়সে সঞ্চয় করবো: সঞ্চয়ের কোন বয়স হয় না। ছোট বয়সেই শিশুরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে বা কারো কাছ থেকে পেলে তা মাটির ব্যাংকে সঞ্চয় করে। অনেকেই ভাবে- "ছাত্র জীবনে সঞ্চয় করবো কোথা থেকে? যা হাত খরচ পাই তাতে আমারই চলে না। চাকরি শুরু করি তারপর সঞ্চয় করবো"। চাকরি পাওয়ার পর ভাবে- "বেতন একটু বাড়ুক তারপর সঞ্চয় করবো"। অথচ চা দোকানে বসে দিনে ৫ কাপ চা পান করে। ২/৩ কাপ চা কম পান করে দিনে ২০/৩০ টাকা সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু বলবে, "আমি খরচই চালাতে পারি না, সঞ্চয় করবো কোথা থেকে? আমার সঞ্চয় করার কোন সুযোগ নেই"। এদের কোন দিনই সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। ফলে বিপদের দিনে দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। না পেলে হয় দিশেহারা, পেলে পারেনা সময়মত ফেরত দিতে। ফলে নষ্ট হয় সম্পর্ক বা পড়তে হয় বিপদে।

তাই আমরা যদি নিয়মিত সঞ্চয় করতে চাই তবে আমাদেরকে সঞ্চয়ের সংজ্ঞাটাকে একটু পাল্টে দিতে হবে। তা হলো- আয় থেকে যে অংশটুকু ভবিষ্যতের জন্য জমা রেখে দিয়ে বাকীটা ব্যয় করি তাকে সঞ্চয় বলে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে **আয় - সঞ্চয় = ব্যয়**।

আমরা কেন সঞ্চয় করবো? আমরা সঞ্চয় করবো কারণ-

১. **সঞ্চয় বিপদের বন্ধু:** সঞ্চয় বিপদের সময়ের বিশ্বস্ত বন্ধু। মনে করো, কোন ছাত্রীর পিতা যে কোন কারণে ঐ ছাত্রীর পরীক্ষার ফিস জমা দিতে পারছেন না। কিন্তু ঐ ছাত্রী যদি অনেক দিন ধরে সামান্য সামান্য করে সঞ্চয় করে, তবে তার জমাকৃত মোট সঞ্চয় হতে এই বিপদের সময়ে তার পরীক্ষার ফিস জমা দিতে পারবে।

২. **সঞ্চয় মনোবল বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ:** যখন নিজের জমানো বেশ কিছু টাকা হাতে থাকবে, তখন নিজের অজান্তেই নিজকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হবে এবং মানসিক শক্তি পাওয়া যাবে।

৩. **সঞ্চয় হতে পারে টাকা বৃদ্ধির একটি উৎস:** টাকা- টাকা আনে, আর সঞ্চয় প্রণোদনা আনে। ইরেসপো'র কিশোরী সংঘের সদস্য ছাত্রী প্রতিমাসে নিজ সঞ্চয়ের দিগুণ হিসেবে (সর্বোচ্চ মাসে ৪০০ টাকা এবং বছরে ৪৮০০ টাকা) প্রণোদনা পাবে। কোন ছাত্রী মাসে ২০০ টাকা করে বছরে ২৪০০ টাকা জমা করলে প্রাপ্ত প্রণোদনা ৪৮০০ টাকাসহ বছর শেষে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে (২৪০০ + ৪৮০০)= ৭২০০ টাকা। সাথে যোগ হবে সঞ্চয়ের উপর প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফা।

৪. **আজকের সঞ্চিত অর্থ হতে পারে আগামী দিনের মূলধন:** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কনা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল। আজ ও আগামী দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা হয়ে ভবিষ্যতে একদিন বড় মূলধনে পরিনত হবে। ঐ মূলধন কোন একটি সম্ভাব্য আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করে নিজে সাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে। কিশোরী সংঘের সদস্য একজন কিশোরীর প্রতি বছরের সঞ্চয় ৭২০০ টাকা হিসেবে ৫ বছর পরে হবে ৩৬০০০ টাকা। এই টাকা নিজে আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় করে নিজের আগামী দিনের খরচ চালানোর পাশাপাশি পরিবারকেও সাহায্য করতে পারবে।

৫. **অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে:** মানুয়ের জীবনে অনেক অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। যার জন্য অনেক সময় অনাকাংক্ষিত খরচের মুখোমুখি হতে হয়। সেই খরচগুলো সামাল দিয়ে জীবনযাপন স্বাভাবিক ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য সঞ্চয়ের বিকল্প নেই।

৬. **নিশ্চিন্ত হবে অবসর জীবন বা বৃদ্ধকাল:** কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে এক সময় আমরা বৃদ্ধ হবো। এ সময় নিজের টাকা-পয়সা না থাকলে কারো কাছে হাত পাততে হয় এবং এক সময় অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত হয়। যা সবচেয়ে দুঃসহ। এজন্য বর্তমানে সঞ্চয় করতে থাকলে অবসর জীবন বা বৃদ্ধকালে কারো কাছে হাত পাততে হবে না বা কেউ অবজ্ঞা করার সুযোগ পাবে না। টাকা থাকলে বৃদ্ধ বয়সে সকলেই আদর ও পরিচর্যা করবে।

হাত খরচ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী সবাই সঞ্চয়ী হতে চায়। কিন্তু, বেহিসেবি স্বভাবের কারণে অনেকেরই তা হয়ে ওঠা হয় না। সঞ্চয় করতে চাইলেও পছন্দের জিনিসটির জন্য নিদ্বিধায় খরচ হয়েই যায়। বিপদে পড়লে তখন মনে হয়- "ইশ! অকারণ খরচগুলো না করলেই হতো"। তাই-

১. **এখন থেকেই সঞ্চয় করবে:** হয়তো মনে হয় "কতটুকুই বা হাত খরচ পাই আবার এ থেকে সঞ্চয় করবো! হাত খরচ একটু বাড়লে বরং করা যাবে"। এরকমটা ভাবলে হয়তো কখনো সঞ্চয় করাই হবে না। টিফিনের খরচ থেকে দৈনিক ৫ টাকা এবং মাঝে মধ্যে হেঁটে গিয়ে ১০/১৫ টাকা রিকশা ভাড়া সাশ্রয়- স্বল্প হলেও এভাবেই সঞ্চয়ের শুরু। কমবয়সে সঞ্চয়ের অভ্যাস দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

২. **সঞ্চয় হিসাব ব্যবহার করবে:** হাতে টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যায়। কিন্তু, সরকারের ইরেসপো' প্রকল্পের কিশোরী সংঘের সদস্য হয়ে হিসাব খুলে প্রতি মাসে টাকা সঞ্চয় করলে প্রয়োজনের সময় এককালীন কিছু গোছানো টাকা হাতে পাওয়া যায়। কিশোরী সংঘের মাধ্যমে টাকা সঞ্চয় করা একটি সহজ ও সুরক্ষিত উপায়। প্রত্যেক মাসে হাত খরচের/আয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশও যদি জমা রাখা যায়, তাহলে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে এটা তিনগুণের বেশি হবে।

৩. **ছোট খরচগুলো সামলে নিতে হবে:** ওই একটুখানি পথ, তাও আবার রিকশায় ওঠা! হেঁটে গেলে কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকার হয়। এভাবেই ঝেড়ে ফেলতে হবে ছোটখাট খরচের অভ্যাসগুলো। এই ছোট-খাটো খরচগুলো সামলে নিলেই অনেকটা সঞ্চয় হয়ে যায়। দেখবে খুশি হবার মতন কোন অংক জমা হয়ে গেছে।

৪. **একটা বাজেট করে ফেল:** খরচ অনুযায়ী বাজেট করে ফেল। বাজেট অনুযায়ী দৈনিক খরচের টাকা পকেটে বা ব্যাগে নিয়ে বের হতে হবে। চেষ্টা করতে হবে সেই বাজেট এর বাইরে কোনো অতিরিক্ত খরচ না করতে। তাহলেই দেখবে কিছু টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

৫. **ইচ্ছে শক্তিটাই আসল:** কথায় আছে, "ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়"। তাই বলছি, ইচ্ছে শক্তিই হল মূল। পথে-ঘাটে, বাজারে অনেক কিছুই চোখে পড়লে কিনতে ইচ্ছে করে। কিছু কেনার সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটু ভেবে দেখতে হবে জিনিসটা কেনা আদৌ জরুরী কিনা; "অন্য কোনভাবে এই চাহিদা কি মিটবে?" এগুলো ভাবলেই বুঝতে পারবেন কোনটা অতিরিক্ত খরচ আর কোনটা অপ্রয়োজনীয়। ঘন ঘন নতুন পোশাক-আশাক কেনা কিংবা প্রায়শই রেস্টুরেন্টে খেতে ঘাওয়া- এরকম আরো দুই একটা অভ্যাস একটু নিয়ন্ত্রণ করলেই দেখবে অর্থ সঞ্চয় কোন ঝামেলার বিষয় নয়।

- ছাত্রজীবনে সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্র জীবনে সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করতে পারলে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায় অন্যদিকে খরচ কমানো যায়।
- সঞ্চয় বৃদ্ধির আর একটি উপায় হল খরচ কমানো। যদিও এ কাজটি ছাত্রজীবনে করা অনেক কঠিন। কেনাকাটার আগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। যেমন ধরো, নতুন বইয়ের পরিবর্তে পুরাতন বই ক্রয় করলে খরচ অনেক কমে যাবে।

- ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয় খাবারের পিছনে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই সেই খাবারটি বাসায় তৈরি করে খাওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভাল থাকে অন্যদিকে সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাবে।
- প্রত্যেক ভোক্তারই দর কষাকষি করে জিনিস কেনার অধিকার রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই দরকষাকষি করতে হবে। অন্যদিকে, ক্লিয়ারিং সেল'র জিনিস কেনার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানী এবং দোকানের ডিসকাউন্টের সুযোগ নিতে হবে। দাম যাচাই এর পর সঠিক দামে কেনাকাটা করতে হবে। অল্প অল্প করে টাকা সাশ্রয় করে সঞ্চয় করা হলে একদিন সঞ্চয়ের পরিমান অনেক বেড়ে যাবে।

অতএব অবশ্যই সঞ্চয় করবে।

"করলে সঞ্চয় ২০০ টাকা, সরকার দেবে ৪০০ টাকা" ।

*এই পুস্তিকা প্রণয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়'র পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর'র বিভিন্ন বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।